



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 652 - 664

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের নির্বাচিত কবিতা : শৈলীগত পর্যালোচনা

রিক্তা সরদার

Email ID: riktasarder44@gmail.com

 0009-0001-2214-5791

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Hungry
Generation,
poetry
movement,
stylistic,
writing style,
contrary of
institution.

Abstract

The poetry movement that began in the mid-nineteenth century centered on various newspapers and magazines gained popularity in the twentieth century. For various reasons, those movements did not last long but they left a clear impression on the minds of readers. One such poetry movement that aroused great response was the Hungry Generation movement. In November 1961, the poets who formed the Hungry Generation movement from Patna and chose a novel method to accelerate the poetry movement by publishing manifestos like handbills. Although the movement was mainly centered on poetry, the manifestos expressed their views on issues such as religion, sexuality, freedom, politics and etc. They did not give priority any vulgarity in the use of words in the manifestos or poetry. They try to destroyed the mentality and strategy of capitalizing on institutional sexuality by making sexuality natural in poetry or prose. Therefore they had to face police harassment. To suppress the movement, the police administration arrested Malay Roychoudhury, the leader of the movement. As a result the news of movement spread very quickly in the country and abroad and Varrious reports of discussion and criticism were printed in newspapers and magazines. Although the movement was initially halted in 1965 but the movement was taken forward by the agitator under a different name. As a result, separate histories were created, due to which various controversies can be seen about the time of organization and the creator of this movement.

Only the Hungry activists raised their voices against institutionalism and traditionalism. The movement has carved a separate place in Bengali literature by writing different genres of literature that have attacked the core of traditional values. It also created a stir in art, society and politics. Sins the hungry activists expressed their thoughts and feelings through handbills, it was not possible to preserve all the bulletins published. the Hungry Generation were very careful about the use of words, subject matter and the context of their poems.

The expressed it through a manifesto. They moved to towards a radical change in traditional literary thought, literary language etc. They wanted to

create a simple style. The characteristics of their writing style will be highlighted through stylistics judgement. Their perspective on literary writing will be highlighted. In stylistic judgement, priority will be given to aspects of word use, parallelism, sentence structure characteristics and the use of imagery.

Discussion

১৯৬১ সালে নভেম্বর মাসে হ্যাভিলের ন্যায় ইস্তাহার প্রকাশের মধ্য দিয়ে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের পথ চলা শুরু। এই আন্দোলন মূলত কবিতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও রাষ্ট্র, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, যৌনতা, স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়গুলির প্রতি এঁদের তীব্র ক্ষোভ, বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছিল তাঁদের লেখা কবিতা ইস্তাহারগুলিতে। এঁরা শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো ছুঁমার্গতাকে প্রাধান্য দেননি। বরং নিষিদ্ধ, অপ্রচলিত, অশ্লীল, অপশব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। প্রাতিষ্ঠানিকের যৌনতাকে পুঁজি করার মানসিকতাকে নষাৎ করে কবিতা ও গদ্যে যৌনতার স্বাভাবিক প্রয়োগ ঘটাতে চেয়েছিলেন। যার কারণে তাঁদেরকে পুলিশী হেনস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আন্দোলনটি দমন করার জন্য পুলিশ প্রশাসন আন্দোলনকারীদের দলনেতা মলয় রায়চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে প্রকাশ্য রাস্তায় কোমরে দড়ি পড়িয়ে ঘোরান। ফলে দ্রুততার সঙ্গে এই আন্দোলনের কথা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকাগুলিতে হাংরি আন্দোলন সম্পর্কিত নানা আলোচনা সমালোচনার প্রতিবেদন ছাপা হতে থাকে। অতঃপর কালের নিয়মে এই আন্দোলনটিরও সমাপ্তি ঘটে। ১৯৬৪-৬৫ সালের পর এই আন্দোলনটি প্রাথমিকভাবে স্তব্ধ হলেও পরবর্তীতে ভিন্ন নামে আন্দোলনটি এগিয়ে নিয়ে যান আন্দোলনকারীরা। ১৯৬৫ সালের পর হাংরি আন্দোলন একাধিক ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে আন্দোলনের আলাদা আলাদা ইতিহাস নির্মিত হয়, যেকারণে এই আন্দোলনের সংগঠিত সময় এবং স্রষ্টা নিয়ে নানা বিতর্ক দেখা দেয়। সে ইতিহাস এখানে আলোচনা করছি না। আমি মূলত হাংরি জেনারেশনের কবিতার শৈলীগত দিকটি আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

শৈলীবিজ্ঞান বা Stylistics হল সাহিত্য সমালোচনার একটি বিশেষ দিক তথা পদ্ধতি। এই বিশেষ সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতিটির উদ্ভব হয় পাশ্চাত্যে, পঞ্চাশের দশকে। নানা বিদ্যার প্রভাবে শৈলীবিজ্ঞানের ধারা আজ পরিপুষ্টতা লাভ করেছে তা বলা বাহুল্য। শৈলীবিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদ ও পদ্ধতি নিয়ে এর নানা শাখার উৎপত্তি ঘটেছে। আমার আলোচনার গতিপথ মূলত সাহিত্য সমালোচনার খাতে প্রবাহিত হবে।

ইংরেজি Stylistics-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে শৈলীবিজ্ঞান শব্দটি বহুল প্রচলিত। সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতিতে শৈলীবিজ্ঞান বলতে আমরা বুঝি রচনাকৌশল, রচনারীতিকে। শৈলীবিজ্ঞান আসলে বস্তুমুখী (objective) সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতি। সাহিত্য তথা রচনার সঙ্গে যুক্ত শব্দ, ধ্বনি, ব্যাকরণ, অর্থ এবং সর্বোপরি সমগ্র বয়ানকে গুরুত্ব দেয় শৈলীবিজ্ঞান। ‘স্টাইল’ অর্থে ‘শৈলী’ শব্দটি যেমন ব্যাপক ব্যবহৃত হয় ঠিক তেমনি এর সাধারণ সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নানা বিতর্ক রয়েছে তা সর্বজন বিদিত। সেই বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আমরা এখানে কোনো আলোচনা রাখছি না। মূলত শৈলীর কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের নিরিখে শৈলীকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। শৈলীর এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় দিয়েছেন ক্রিস্টাল ও ডেভি (১৯৬৯) -

প্রথমত, শৈলী হল ব্যক্তির ভাষা প্রয়োগের নিজস্বতা। এই নিজস্বতা ধরা পড়ে লেখকের ভাষা প্রয়োগের সমগ্রতায়, আবার কখনও তাঁর বিশেষ কিছু লক্ষণের নিরিখে।

দ্বিতীয়ত, সময়ের ব্যবধানে ব্যক্তি বিশেষে একই ধরনের ভাষা ব্যবহারকারী সাহিত্যিকগণ নির্মাণ করে থাকেন নিজস্ব ভাষাশৈলী।

তৃতীয়ত, সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যে শৈলী ব্যবহৃত হয়।

চতুর্থত, শৈলী চিহ্নিত হতে পারে সাহিত্যের ভাষার মানক রূপেই। কেননা শৈলী রচনার নান্দনিকতা, সৌন্দর্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।^১

শৈলী বা স্টাইল কী সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পবিত্র সরকার তাঁর ‘গদ্যরীতি পদ্যরীতি’ গ্রন্থে শৈলী প্রসঙ্গে বলেছেন, শৈলী হল লেখকের সচেতন বা অসচেতনভাবে নির্বাচিত ভাষাগত উপায়, যার দ্বারা তিনি পাঠকের সঙ্গে অভিপ্রেত যোগাযোগ সাধন করতে পারেন। ব্যক্তির নিজস্ব স্টাইল হল শৈলী। শৈলী হল লেখকের প্রকাশভঙ্গি। সেকারণে ব্যক্তির চরিত্রভেদে সাহিত্যের প্রকরণ পৃথক হয়। কোনো একটি নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে একই সময়ে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র সাহিত্যিকদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যে সেটি আলাদা আলাদা সংরূপের আকার নেয়। কিংবা একই বিষয় নিয়ে একই প্রকরণের সাহিত্য রচনা করলেও প্রত্যেক সাহিত্যিকের পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সাহিত্য আলাদা হয়ে যায়। সাহিত্যিকগণ নিজ নিজ সাহিত্য রচনায় অনন্যতা লাভ করেন। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করব। যেমন- দেশভাগকে যদি আমরা একটি নির্দিষ্ট ঘটনা হিসাবে নির্বাচন করি তাহলে দেখতে পাব দেশভাগকে কেন্দ্র করে সময়কালীন ও পরবর্তী বহু কবি-সাহিত্যিক বিভিন্ন সংরূপে একাধিক সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁদের সাহিত্য সংরূপ আলাদা হয়েছে তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং উপস্থাপনের কারণে। তাই কেউ লিখেছেন গল্প (এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা- জ্যোতির্ময়ী দেবী), কেউ লিখেছেন উপন্যাস (নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে- অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়), কেউবা কবিতা (খুকু ও খোকা - অন্নদাশঙ্কর রায়)।

সাহিত্য রচনার সময় লেখক তাঁর নিজস্ব ভাষাভাঙার বলা ভালো শব্দভান্ডার থেকে প্রয়োজনীয় শব্দ বাছাই করে থাকেন। লেখকের এই শব্দ নির্বাচন প্রক্রিয়ার অভিনবত্বই হল শৈলীর অন্তর্গত বিচার্য বিষয়। এছাড়া লেখক এই শব্দচয়ন প্রক্রিয়াতে কতটা সচেতন ছিলেন কিংবা কতটাই বা অর্ধসচেতন কিংবা অচেতন ছিলেন তা শৈলীবিচারের আওতাভুক্ত। হাংরি কবির তাঁদের কবিতায় অধিকাংশ সময়ে সচেতনতায় শব্দ নির্বাচন করেছেন। তাঁদের মতে, সচেতনতায় সম্পূর্ণরূপে বর্বরতার মধ্যে মুক্ত কাব্যিক প্রজ্ঞার নিষ্ঠুরতার দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করাই হল কবিতা। তাই তাঁরা ইচ্ছে করে নিম্ন সম্প্রদায়ের ভাষা, গালাগাল, অভিব্যক্তিকে কবিতায় প্রাধান্য দিয়েছেন। হাংরি কবি মলয় রায়চৌধুরীর মতে, কাগজের উপর নিজের ছেঁড়া জিভকে পেতে দেওয়ার নাম কবিতা। যার মধ্যে কোনোরকম কোনো আবরণ থাকবে না। একারণেই তাঁদের কবিতাগুলিকে অশ্লীলতার ট্যাগ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হাংরি কবির তাঁদের লিখিত কবিতায় তথাকথিত অশ্লীল, অমার্জিত, অনাভিধানিক শব্দের বহুল প্রয়োগ করেছেন। যা গতানুগতিক সাহিত্য ধারায় ব্যবহারের নিষিদ্ধতা ছিল। মান্য অভিধানে নেই এমন সব শব্দ ব্যবহারের ফলে পাঠক মহল থেকে নানা প্রতিক্রিয়া আসতে শুরু করে। নানা আলোচনা সমালোচনার সম্মুখীন তাঁদেরকে হতে হয়েছিল কিন্তু তাঁরা এই অনাভিধানিক শব্দ ব্যবহারে অব্যাহতি দেননি। বরং এই সমস্ত শব্দগুলিকে আরো চাঁচাছোলা করে সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন। সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের নির্মিত শব্দ ভাণ্ডারকে কেবলমাত্র সাহিত্যে ব্যবহার করার রীতিকে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। নীচুতলার মানুষের ব্যবহৃত শব্দগুলিকে সাহিত্যে ব্রাত্য রাখার প্রবণতাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন একাধিক কবিতায় নীচুতলার অভিব্যক্তি, গুরুচণ্ডালী শব্দগঠন ও বাক্য প্রয়োগের মাধ্যমে।

এছাড়াও একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরে ব্যবহৃত মনস্তিতি প্রকাশকালীন অব্যয়ের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন একাধিক কবিতায়। আসলে হাংরি কবির নিম্নশ্রেণির মানুষের অভিব্যক্তি, গুরুচণ্ডালী শব্দগঠন, বাক্য প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন ধরনের শৈলীর সৃষ্টি করেছিলেন বলে তাঁরা মনে করেন। কয়েকটি কবিতার উদাহরণ দিয়ে তাঁদের নির্বাচিত অধিক প্রয়োগ করা শব্দগুলিকে চিহ্নিত করার প্রয়াস করব।

প্রথমেই মলয় রায়চৌধুরীর ‘প্রচন্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ কবিতাটি আলোচনা করব।^১ এই কবিতাটিতে ব্যবহৃত তথাকথিত অমার্জিত অনাভিধানিক শব্দগুলি তুলে ধরা হবে। কেননা এই কবিতাটিকে অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট হতে হয়েছিল। এমনকি মলয় রায়চৌধুরীকে আইনি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

- ১। শুভা আমাকে তোমার তমুর্জ আঙুরাখার ভেতরে চলে যেতে দাও।
- ২। যোনি মেলে ধরো।
- ৩। ... আমি দুকোটি আলোকবর্ষ ঈশ্বরের পোঁদে চুমু খেতুম।
- ৪। সব ভেঙে চুরমার করে দেব শালা।
- ৫। শুভাকে হিঁচড়ে উঠিয়ে নিয়ে যাব আমার ক্ষুধায়।

- ৬। প্রস্রাবের পর শেষ ফোঁটা ঝাড়ার দায়িত্ব আমায় শিখতে হয়নি।
৭। যোনি কেশরের কাঁচের টুকরোর মতো ঘামের সুস্থতা।
৮। তোমার তীব্র যুটেরাসে ঘুমতে দাও কিছুকাল শুভা।
৯। তোমার ঋতুস্রাবে ধুয়ে যেতে দাও আমার পাততড়িত কঙ্কাল।
১০। আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ।
১১। কেন আমি হারিয়ে যাইনি তোমার যোনিবর্তে।
১২। কেন আমি পিতার আত্মমৈথুনের পর তার পেছাপে বয়ে যাইনি।
১৩। পায়জামায় শুকিয়ে যাওয়া বীর্য থেকে ডানা মেলছে ৩০০০০০ শিশু উড়ে যাচ্ছে।
শুভার স্তনমন্ডলীর দিকে।
১৪। এখন আমার জেদি ঠাণ্ডের চোরাচালান সেদোঁতে চাইছে।

মলয় রায়চৌধুরী ‘প্রচলিত বৈদ্যুতিক ছুতার’ কবিতায় সামাজিক মানদণ্ডের বিচারে রুচিবোধের বিপরীতমুখী শব্দ ব্যবহার করেছেন। এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন যা হয়তো সামাজিক রুচিবোধের বিরুদ্ধগামী শব্দ নয় তৎসত্ত্বেও বাক্যে প্রকাশিত অর্থের নিরিখে তা অশ্লীলতার দোষে দূষিত। ৯০টি লাইনের এই কবিতায় মলয় রায়চৌধুরী যৌনতার যে স্বাভাবিক চিত্র কিংবা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেছেন তা শিল্পমণ্ডিত রূপ নিয়েছে বলে তিনি মনে করেন। বিষয়টির স্বরূপ কেমন তা শব্দগুলোর পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়। যেমন -

- i. ‘তরমুজ’ শব্দটির মূল অর্থ একটি বড়ো গোল ফল যার শাঁস লাল ও বীজ কালো। অন্যদিকে ‘আঙুরাখা’ শব্দটি সংস্কৃত শব্দ অঙ্গরক্ষক থেকে এসেছে। যার অর্থ দেহের সুরক্ষা।^৩ এটি প্রাচীনকালে পুরুষদের পরিহিত একটি ঐতিহ্যবাহী পোশাক।^৪ কবিতায় ‘তরমুজ’ ও ‘আঙুরাখা’ শব্দদুটি একত্রে ব্যবহার করে কবি নারীদেহের যৌনস্থানকে বুঝিয়েছেন।
- ii. ‘যোনি মেলে ধরো’ এই বাক্যটি প্রয়োগের মাধ্যমে কবি নারীর যৌনস্থানকে বুঝিয়েছেন। পাশাপাশি নারী-পুরুষের মিলনের মুহূর্তকে নির্দেশ করেছেন।
- iii. ‘ঈশ্বর’ শব্দের সাধারণ অর্থ প্রভু/ স্বকার্যকরণক্ষম।^৫ ‘ঈশ্বর’ শব্দটি শুনলেই প্রথমে যে কথা আমাদের মাথায় আসে তা হল যিনি আমাদের আরাধ্য দেবতা, যিনি পূজনীয়, যিনি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। তিনি চাইলেই বিশ্বসংসারের সমস্ত দুঃখ-দারিদ্র্য-হিংসা-বিবাদ নির্মূল করতে পারেন। সেই ‘ঈশ্বর’ শব্দটির সঙ্গে কবি ‘পোঁদে’ শব্দটি জুড়ে দিয়ে ‘ঈশ্বর’ শব্দটির সঙ্গে জুড়ে থাকা পবিত্রতার ভাবনাকে আঘাত করেছেন। ঈশ্বরের অসাধারণত্বকে অস্বীকার করে তাকে যখন কবি সাধারণত্ব নামিয়ে আনেন তখন তার মধ্যে আর পূর্বের কোনো শুদ্ধতা, পবিত্রতা কিংবা ভক্তি ততটা থাকে না। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের ভক্তির সম্পর্ক তখন তলানিতে ঠেকে। এখানে কবি কোনো শিল্প সৌন্দর্য সৃষ্টি করেননি। এই ধরনের শব্দচয়নের মধ্য দিয়ে কবির প্রথাগত ধ্যানধারণার মূলে কুঠারঘাত করার মানসিকতা অনেক বেশি নজর কাড়ে সাধারণ পাঠক-সমালোচকের।
- iv. ‘শালা’ শব্দের প্রকৃত অর্থ স্ত্রীর ভাই/দাদা। কিন্তু এই শব্দটির অর্থসংক্রম হয়ে গালাগালি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাউকে অপমান করার জন্য তাকে গালি দিয়ে ‘শালা’ শব্দটির প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। শালা শব্দটি গালাগালি অর্থে সুপ্রাচীন কাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তার প্রমাণ রয়েছে মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে - ‘লভে ভন্ডে দেয় গালি বলে শালামালা’^৬। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে কবিগান খেউড় গানে এই শব্দটির বহুল ব্যবহার হয়েছিল। তৎকালীন কবিরায়েরা যুগরুচির কথা মাথায় রেখে এই অমান্য শব্দগুলো গানে ব্যবহার করত বলে মনে করা হয়। আলোচিত কবিতায় এই শব্দটির ব্যবহার করে কবি তাঁর বিরক্তি, ক্ষোভ, অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।
- v. ‘শুভাকে হিঁচড়ে উঠিয়ে নিয়ে যাব আমার ক্ষুধায়/ শুভাকে দিতেই হবে’-এই বাক্যটির মধ্যে কোনো অমান্য, অনাভিধানিক শব্দ প্রয়োগ করা হয়নি তথাপি এই বাক্যে যে অর্থ প্রকাশ পায় তা নারীর প্রতি পুরুষের যৌন চাহিদাকে সরাসরি ইঙ্গিত করে।
- vi. ‘যোনি কেশরের কাঁচের টুকরোর মতো ঘামের সুস্থতা’ বাক্যটি নির্মাণ করে কবি গতানুগতিক সৌন্দর্যবোধের সমান্তরাল একটি সৌন্দর্যবোধ নির্মাণ করার প্রয়াস করেছেন। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি লাইন খুবই প্রযোজ্য- ‘একটি

ধানের শিষের উপর একটি শিশির বিন্দু'। ধানের শিষের উপর শিশির বিন্দু পড়লে যে অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে কবি মলয় রায়চৌধুরী যোনি কেশরে কাঁচের টুকরোর মত ঘামের প্রসঙ্গের উল্লেখ করে প্রায় সমান্তরাল কিন্তু ভিন্ন স্বাদের সৌন্দর্যবোধ নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন এবং এক্ষেত্রে সফলও হয়েছেন বলা যায়।

vii. 'প্রস্রাবের পর শেষ ফোঁটা ঝাড়ার দায়িত্ব আমায় শিখতে হয়নি' - এই বাক্যটির মধ্য দিয়ে কবি পুরুষের শারীরিক একটি ক্রিয়াকে স্পষ্টত নিদর্শন করেছেন।

viii. 'আ আ আ আ আ আ আ আ আ' - কবিতায় 'আ' বর্ণের একাধিকবার প্রয়োগের মাধ্যমে কবি তার প্রেমিকার সঙ্গে একান্ত ব্যক্তিগত মিলন মুহূর্তের মনস্থিতিকে নির্দেশ করেছেন বলে মনে করা যেতে পারে। আবার প্রেমিকা শুভার সঙ্গে দৈহিক মিলিত হতে না পাওয়ার যন্ত্রণা, উত্তেজনা প্রকাশ পেয়েছে একাধিক 'আ' এর ব্যবহারে।

শৈলেশ্বর ঘোষের 'ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা'^৭ কবিতাটির কয়েকটি লাইন তুলে তাঁর শব্দ চয়নের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হল -

- ১। দিনমানভর তেত্রিশ হিজড়ের গর্ভ হয়।
- ২। দাতব্য চিকিৎসালয় খুলেছি আমরা পেছাপথানায়।
- ৩। কলকারখানা প্রসব করে।
- ৪। সারাদিনমান কবিতার হে ঘোড়া এ কী ঋতুস্রাব!
- ৫। ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন বসে আছি জুয়াচোর বেশ্যার মন্দিরে।
- ৬। ছাব্বিশ বছরের উপরই বলাৎকার ছাব্বিশ বছর।
- ৭। জানাগেছে জুয়ার টেবিলেই হয়েছিল বুদ্ধের জ্ঞান।
- ৮। তিনবিধবা গর্ভ করে শুয়ে আছি পুণ্য বিছানায়।
- ৯। কলকাতায় তিনগেলাস স্বাস্থ্যসুধাপান।

পরিভ্রাণীহীনতা হাসে পুরুষের নামাবলীগীতা।

ধাতুধর্ম সাতবার গড়াগড়ি খায়।

- ১০। গীতার্ধমপাঠ শুনে কুকুরের অভ্যকোষে ধাতুমুদ্রা জমে।

শৈলেশ্বর ঘোষ তাঁর 'ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা' এই দীর্ঘ কবিতায় প্রথাগত বহু ধ্যানধারণায় আঘাত করেছেন। পাশাপাশি গুরুচণ্ডালী শব্দপ্রয়োগের মাধ্যমে গতানুগতিক সুস্থ মানসিক ভাবনাচিন্তার জগতে বিক্ষিপ্তভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন।

ক। 'দিনমানভর তেত্রিশ হিজড়ের গর্ভ হয়' - এই বক্তব্যটির মধ্য দিয়ে প্রচলিত ধারণার বিপরীত বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। নারীর গর্ভ হয়, পুরুষ কিংবা হিজড়ের গর্ভ হওয়া সম্ভব নয়। কবি 'হিজড়ের গর্ভ হয়' কথাটি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে নারীর মাতৃত্বের সৌন্দর্য ও প্রথাগত ধারণার মূলে আঘাত করেছেন।

খ। 'দাতব্য চিকিৎসালয় খুলেছি আমরা পেছাপথানায়' - চিকিৎসালয় শব্দটি মানুষের হিতসাধনের একটি স্থান। যেখানে গেলে মানুষ উপকৃত হয়। সেই স্থানের সঙ্গে যখন মানুষের প্রস্রাবগারের তুলনা করা হয় তখন সেটি তাক্ষিল্য, ক্ষোভ বা গালাগালির ইঙ্গিত বহন করে। এখানে কবি সমাজের একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ব্যঙ্গ করেছেন।

গ। 'সারাদিনমানভর কবিতার হে ঘোড়া এ কী ঋতুস্রাব' - এখানে ঋতুস্রাব শব্দটি প্রয়োগ করে কবি মাসিক পত্রিকাগুলিকে ব্যঙ্গ করেছেন বলা যেতে পারে। প্রত্যেক মাসে নারীর যেমন মাসিক হয় ঠিক তেমনি করে যেন মাসিক পত্রিকাগুলিতে কবিতার আবির্ভাব ঘটছে।

ঘ। 'জানা গেছে জুয়ার টেবিলেই হয়েছিল বুদ্ধের জ্ঞান' - গৌতম বুদ্ধকে জুয়ার টেবিলে নিয়ে তাঁর অর্জিত জ্ঞানকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে বলা যেতে পারে। জুয়া এবং বুদ্ধের জ্ঞান শব্দদুটি প্রয়োগ করে কবি মিশ্র ইমেজ নির্মাণ করে সুস্থ ভাবনা-চিন্তার জগতে বিক্ষিপ্ততা ছড়াতে চেয়েছেন বলে মনে হয়।

ঙ। ‘গীতাধর্ম পাঠ শুনে কুকুরের অভ্যকোষে ধাতুমুদ্রা জমে’ - এই বক্তব্যের মধ্য দিয়েও প্রচলিত ধারণার ইমেজকে কবি ভেঙে দিতে চেয়েছেন। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী যে গীতাপাঠ শুনে মানুষের মনে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সঞ্চার হয়, মানুষের মনে প্রশান্তি জাগে, সং কর্মকাণ্ডে মানুষ ব্রতী হয় সেই গীতাপাঠ শুনে কুকুরের অভ্যকোষে ধাতুমুদ্রা জমার যে উপমা কবি দিয়েছেন তাতে যাবতীয় পবিত্র ধারণার প্রতি আমাদের ঘৃণা জন্ম নেয়। ভেঙে যায় সকল পবিত্রতা অপবিত্রতার ধারণা।

একইভাবে ত্রিদিব মিত্রের ‘হত্যাকাণ্ড’ কবিতায় অপশব্দ বা গালাগালির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। শব্দ নির্বাচনে তিনি কীরূপ বৈচিত্র্যতা এনেছিলেন কয়েকটি উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক -

১। আঃ মৃত্যু বাঞ্ছাৎ মৃত্যু।

২। ওঃ আমার আর সবার মাঝখানে গজিয়ে উঠছে একটা সুদীর্ঘ গভীর ফাটল।

৩। আমাকে বারবার জীবন থেকে হড়কে জীবনের ফাঁদেই পড়তে হচ্ছে।

মৃত্যু কেবলই কেবলই প্রতারণা করছে আমার সঙ্গে।

প্রথম উদাহরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি কবি অশ্লীল গালাগালি প্রয়োগ করেছেন। মৃত্যুর প্রতি তীব্র বিরাগ বিরক্তিবাব থেকে কবি এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ করেছেন। অন্যদিকে আমরা যদি তিন নাম্বার উদাহরণের দিকে খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাব কবির এই বিরক্তিবাবের আসল কারণ। মৃত্যু কবির সঙ্গে বারবার প্রতারণা করছে। বারবার জীবন যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হতে কবি ক্লান্ত হয়ে মৃত্যুকে গালাগালি দিয়েছেন। সমগ্র কবিতা জুড়ে মৃত্যু সম্পর্কে কবির মনোভাবের দিকটি পরিস্ফুটিত হয়েছে।

হাংরি জেনারেশনের কবিরা শব্দের যুক্তি নির্ভর কাঠামো ধ্বংস করার জন্য, শব্দের শ্রেণি বৈষম্যতা দূর করার জন্য বহু অপশব্দ (গালাগালি), অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন। প্রয়োজনে একাধিক ইংরেজি শব্দের ব্যবহার করতে দেখা যায়। নিম্নে সেগুলির একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল -

ইংরেজি শব্দ : চ্যালেঞ্জ, টেলিফোন, অ্যালকোহলিক গ্লোব, কটেক্স, মনুমেন্ট ময়দান, ড্রয়ার, প্রেগন্যান্ট।

অপশব্দ বা স্ল্যাং : বাঞ্ছাৎ, কুঁকড়ে, শালা, ঠ্যাঙ সৈঁদোতে, ন্যাংটো, মাদিমদ, অণ্ডকোষ, বেশ্যার নাঙ।

অপ্রচলিত শব্দ : হড়কে, বেলেপ্পাণা, চোলাই কারবার, আঁতকে, কঁকিয়ে, হিঁচড়ে, খেয়োখেয়ি, ফাটকায়, পেছাপাখানা, বেহদ, ন্যাকড়া।

এবার আসি কবিতার শৈলীবিচারে সমান্তরালতার ভূমিকা প্রসঙ্গে। যখন কোনো বাক্য গঠনের দিক থেকে সমান্তরাল, বা একই গঠনের পুনরাবৃত্তি থাকে তাকে সমান্তরালতা বলা হয়ে থাকে। সুতরাং সমান্তরালতা বলতে আমরা বুঝি যে সমদৈর্ঘ্যের বা সমমূল্যের বাক্যগঠনকে। অর্থাৎ বাক্যের কর্তা কর্ম ক্রিয়া প্রায় একইরকম। সেক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে সমান্তরালতা কেবলমাত্র কোনো একটি বা দুটি বাক্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে এমন কোনো বিষয় নয় তা অনেকক্ষেত্রে একটা অনুচ্ছেদ জুড়ে থাকতে পারে আবার সমগ্র কবিতা জুড়েও থাকতে পারে। সমান্তরালতা গদ্য ও পদ্য উভয়ক্ষেত্রেই দেখা যায়। সমান্তরালতা মূলত বাক্যের ‘principles of equivalence’ এবং ‘repetition of same structural pattern’ কে গুরুত্ব দেয়। রেললাইন যেমন সমান্তরালভাবে চলে, ঠিক তেমনি সাহিত্য লেখকেরা সমান্তরাল বাক্য নির্মাণ করে থাকেন নিজস্ব মতামতকে ব্যক্ত করতে। এই সমান্তরাল বাক্য ব্যবহৃত একই ধরনের শব্দের একাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে লেখকের অভিপ্রায় প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে। যখন কোনো লেখকের রচনাতে সমান্তরাল বাক্য প্রয়োগের প্রবণতা অধিকমাত্রায় দৃষ্টিগোচর হয় তখন বুঝে নিতে হবে সেটি লেখকের রচনারীতির একটি বৈশিষ্ট্য।

বাংলা ভাষায় সমান্তরালতা বা Parallelism নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন শিশিরকুমার দাশ। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যভাষায় সমান্তরাল বাক্যগঠনের প্রবণতাকে তাঁর রচনাইশৈলীর অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে। ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী সমান্তরালতা তত্ত্বের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ‘government and binding’ পদ্ধতির principles and parameter তত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় Ken Safir প্রবর্তিত PCOB তত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলা ভাষায় সমান্তরালতা অনুসন্ধানের একটি সূত্র নির্মাণ করেছেন। Multiple Variable Binding (Linguistic Inquiry 1984) প্রবন্ধে Ken Safir PCOB (Parallel Constraint of Operation Binding) তত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন

যদি ‘X’ চালক এবং ‘Y’ চল হয় তাহলে ‘Y’ চলটি ‘X’ চালক দ্বারা আবদ্ধ হয়, তাহলে যেকোনো ‘Z’ এর ক্ষেত্রে ‘Z’ একটি চল যা ‘X’-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।^৭

১। চালক	চল	চল
‘আয়রে সাধনা	আমরা সেলিব্রেট করি	তোর ‘৬৬’ বিয়ে
আয়রে সাধনা	আমরা লিঙ্গ খুলে রেখে	ভালোবাসা করি” ^৮

(রাইনের মারিয়া রিলকের জন্মদিনে ১৫ পয়সায় ডাকটিকিট- কবি সুবো আচার্য)

এখানে চালক হল ‘আয়রে সাধনা’ এবং তার চল হল ‘আমরা সেলিব্রেট করি তোর ৬৬ বিয়ে’ ও ‘আমরা লিঙ্গ খুলে রেখে ভালোবাসা করি’। ক্রিয়াপদ ‘করি’-এর পুনরাবৃত্তি হয়ে সমান্তরাল গঠন হয়েছে।

ফাল্গুনী রায়ের ‘মানুষের সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই’ নামক কবিতায়ও সমান্তরাল বাক্য গঠনের দেখা মেলে।

২।	চালক	চল
	রামকৃষ্ণের কালিপ্রমে দেখি	সার্বভৌম যৌনশান্তি
	বাবলিদের স্বামীপ্রমে দেখি	সার্বজনীন যৌনসুখ” ^৯

এখানে ‘প্রমে দেখি’ হল চালক। কবি প্রেমকে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করে তার পার্থক্য নির্মাণ করলেও প্রতি ক্ষেত্রেই যৌনতাকেই কেন্দ্রীভূত করেছেন। রামকৃষ্ণের দেবী কালির প্রতি যে প্রেম সেখানেও যেমন যৌনশান্তির বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে তেমনি বাবলিদের স্বামীপ্রমে যৌনসুখের কথাও উত্থাপন করা হয়েছে। এখানে কবি সার্বজনীন-সার্বভৌম, সুখ-শান্তি উভয়ক্ষেত্রে প্রতিশব্দের সমান্তরাল ব্যবহার করে পাঠকের কাছে তার অর্থকে ঘনীভূত করতে চেয়েছেন।

৩। রবীন্দ্রনাথের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা - মলয় রায়চৌধুরী

চালক	চল
আমাকে ক্ষমা করো	মানুষের মগজ নষ্ট হোক...
	লাথি লেগে ভাতের থালার উপর জলের গ্লাস উল্টে পড়ুক
আমাকে ক্ষমা করো	সন্তানের আত্মমৈথুন করা হাতে মুখাঙ্গি...” ^{১০}

এখানে চালক হল ‘আমাকে ক্ষমা করো’। এখানে চালক অংশকে কেন্দ্র করে কবি তার অভিপ্রেত বক্তব্যগুলি একের পর এক বলে গিয়েছেন। ফলে সমান্তরাল বাক্যগঠন নির্মিত হয়েছে। তাঁর বক্তব্যগুলি যে অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে তা কবি আগে থেকেই জানেন তাই ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে নিজের বক্তব্য বিষয়গুলি উপস্থাপিত করেছেন।

৪। কুকথা বিষয়ক - উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

চালক	চল
কোনো কুকথা শুনে	বিপ্লবী লিঙ্গ খসিয়ে হয়ে যাবে ব্রহ্মচারী
কোনো কুকথা শুনে	সহায় সম্বলহীন কবি যাবে মদের দোকানে
কোনো কুকথা শুনে	বেশ্যা তার নিজের শরীরকে ‘থু’ করে বলবে আমি জনক দুহিতা
কোনো কুকথা শুনে	সুগু গহ্বর থেকে উড়ে যাবে অন্ধবাদুড়...
কোনো কুকথা শুনে	মানব কুকুর দুই ভালোবাসার জন্য বেছে নেবে শরীর কিংবা গিলোটিন” ^{১১}

কবি সমগ্র কবিতাটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমান্তরাল বাক্য গঠনের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। ‘কোনো কুকথা শুনে’ পদগুচ্ছের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কবি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এমনকি অন্য প্রাণী কীরূপ আচরণ করবে তা সমান্তরাল বাক্য গঠনের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। কবিতাটির সমগ্র অংশ জুড়ে একটি বিশেষ ঐক্য রয়েছে। ক স্তম্ভের পদগুচ্ছের দৈর্ঘ্য সমান। খ স্তম্ভের পদগুচ্ছের দৈর্ঘ্য এবং বক্তব্য পৃথক হলেও ক্রিয়াপদ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কবি সমান্তরালতা নির্মাণ করেছেন। যেমন- ‘যাবে’, ‘বলবে’, ‘বেছে নেবে’ ইত্যাদি। সমস্ত ক্রিয়াপদগুলি ভবিষ্যৎ কালের।

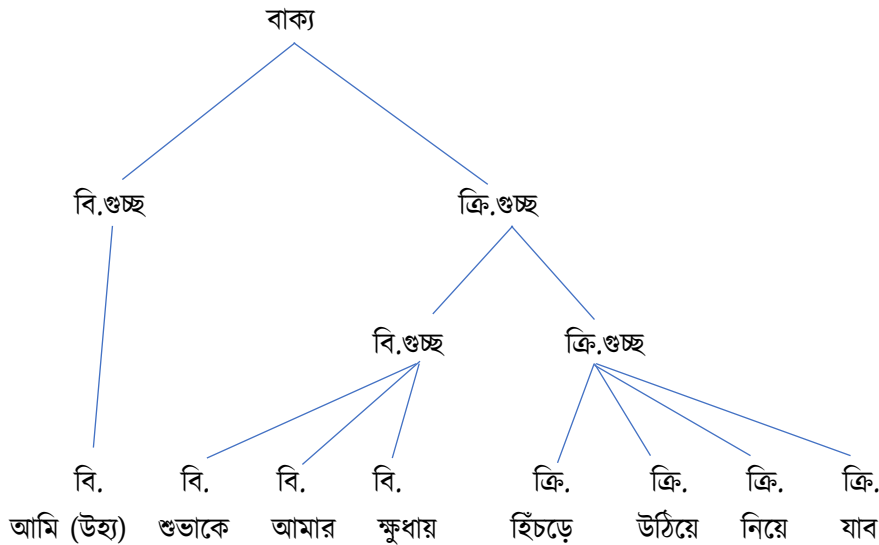
হাংরি জেনারেশনের কবিরা সাহিত্য প্রকরণ, তার বিষয়, প্রকাশভঙ্গির বিপুল পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন। সেই কারণে তাঁরা রচনারীতির ধারাটি অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে। তাঁদের রচনাশৈলীর একটি বিশেষ দিক হল

সমান্তরাল বাক্য নির্মাণ। আমরা জানি যে সাহিত্যের ভাষায় সমান্তরাল বাক্য প্রয়োগ করলে তা পাঠকের মনে খুব তাড়াতাড়ি প্রভাব বিস্তার করে। প্রায় একই ধরনের বাক্য একাধিকবার ব্যবহারের ফলে পাঠকের মনে অর্থের পুনঃপুনঃ অভিঘাত এসে পড়ে, তখন পাঠক সেই বিষয়টির প্রতি আরো বেশি করে মনোনিবেশ করেন।

যেকোনো সাহিত্যের শৈলীবিচার করতে হলে প্রথমেই লেখকের বাক্য রচনাকৌশলটি বুঝে নিতে হবে। বাক্য রচনা করতে হলে ব্যাকরণ জানা উচিত। চমস্কি 'Aspects of the Theory of syntax' গ্রন্থে জানিয়েছেন আমরা যখন আমাদের নিজ নিজ মাতৃভাষা ব্যবহার করি তখন আমরা নিজেদের অজান্তেই মাতৃভাষার ব্যাকরণ জেনে যাই। কেননা আমাদের মস্তিষ্কে থাকা শব্দভাণ্ডার থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় শব্দ নির্বাচন করি। এবং সেই সমস্ত পদগুচ্ছের সমন্বয়ে বাক্য গঠন করি, যাকে অধোগঠন বলে (Deep Structure)। এর পরবর্তী স্তর অর্থাৎ মুখে উচ্চারিত বাক্যকে বলি অধিগঠন (Surface Structure)। সাহিত্যের পদ্য হোক কিংবা গদ্য উভয়ক্ষেত্রেই শৈলীর স্বতন্ত্রতা অনুভব করতে সাহায্য করে অস্বয় বিশ্লেষণ। অস্বয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখকের ভাষা নির্মাণ দক্ষতা প্রকাশ পায়।

হাংরি কবি সাহিত্যিকরা প্রথাগত কোনো ধারণাকে অনুসরণ করে অগ্রসর হতে চাননি। ধ্বংসের মাধ্যমে তাঁরা নতুন সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠতে চেয়েছেন। হাংরি কবিরা প্রথাগত চিন্তাধারার পরিবর্তন করে নতুন শৈলী নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন বলে তাঁরা মনে করেন। সংবর্তনী ব্যাকরণের সূত্র ধরে আমরা তাঁদের কবিতাগুলির আন্বয়িক বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরার প্রয়াস করছি। হাংরি কবিরা কোনো প্রথাগত জাঁর বা ফর্মকে প্রাধান্য দিতেন না। তাঁরা ফর্মের খাঁচায় বিশ্বপ্রকৃতির ফাঁদ পাতাকে কবিতা বলে মনে করতেন না। তাঁদের এই চিন্তাভাবনা তথা মতবাদ কতটা ফলপ্রসূ হয়েছিল কিংবা তাঁরা এই মতবাদকে কতটা মেনে চলেছিলেন সেগুলি বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করব -

১. 'শুভাকে হিঁচড়ে উঠিয়ে নিয়ে যাব আমার ক্ষুধায়' (প্রচন্ড বৈদ্যুতিক ছুতার - মলয় রায়চৌধুরি) -



- এখানে আমি উহা রয়েছে। অর্থাৎ কর্তার বিলোপন ঘটেছে।

বাংলা বাক্যের নিয়ম অনুযায়ী (কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া) এই বাক্যের গঠন হত এই রকম -

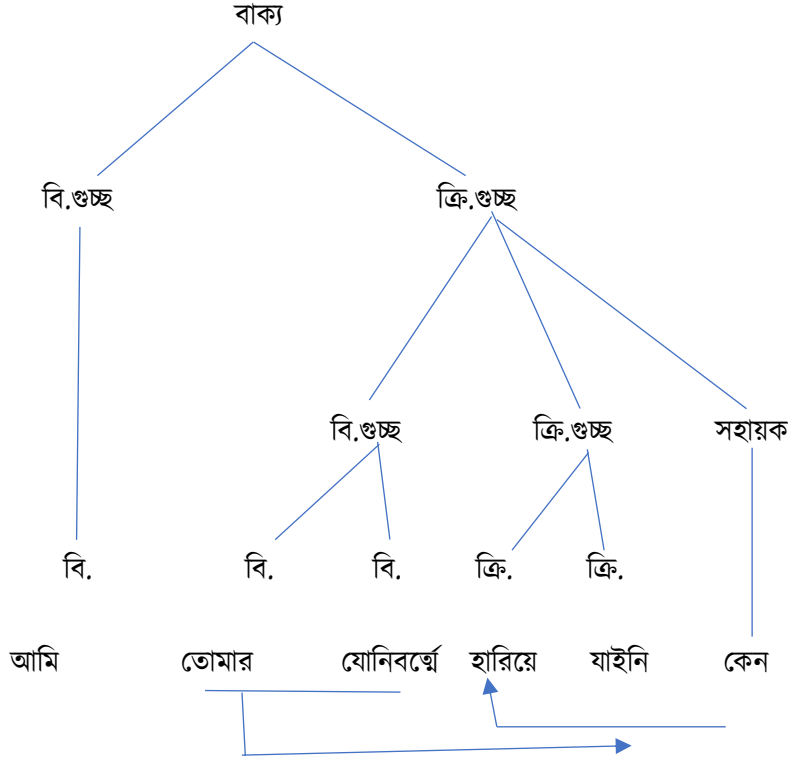
আমার ক্ষুধায় শুভাকে হিঁচড়ে উঠিয়ে নিয়ে যাব।

কিন্তু এখানে কর্ম ক্রিয়া কর্তা প্রত্যেকেরই পারস্পরিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায় ফলে বাক্যের গঠন দাঁড়িয়েছে -

'শুভাকে হিঁচড়ে উঠিয়ে নিয়ে যাব আমার ক্ষুধায়'।

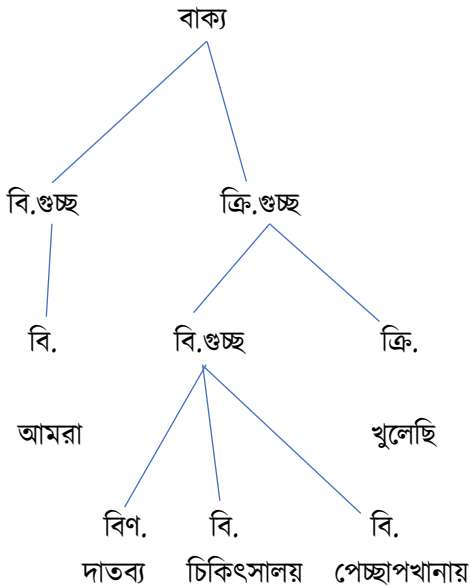
কবি এখানে কবিতার সৌন্দর্য তথা শ্রুতিমাধুর্যের দিকটি মাথায় রেখে কর্ম ক্রিয়ার স্থান পরিবর্তন করে বাক্যের বিপর্যাস ঘটিয়েছেন একথা আমরা বলতে পারি।

২. 'কেন আমি হারিয়ে যাইনি তোমার যোনিবর্ন্তে' (প্রচন্ড বৈদ্যুতিক ছুতার- মলয় রায়চৌধুরী) -



এখানে ক্রিয়া ও কর্ম উভয়েরই স্থান পরিবর্তনের কারণে বিপর্যাস ঘটেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে ক্রিয়া ও কর্মস্থান বিনিময় করলেও কর্তা নিজের স্থানে অবিচল রয়েছে অর্থাৎ কর্তার স্থান পরিবর্তন হয়নি। ইংরেজি বাক্যের গঠনের ন্যায় কর্তা রয়েছে একাবারে বাক্যের শুরুতে অতঃপর ক্রিয়া ও কর্মের অবস্থান। সুতরাং, একথা বলা যায় যে এখানে ইংরেজি বাক্যের গঠনকে অনুসরণ করে বাক্য গঠন করা হয়েছে। কবি 'কেন' অব্যয়ের উপর জোর দিয়ে বাক্যের বিপর্যাস সৃষ্টি করেছেন। বিচ্যুতি কবিতার একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কবি তাঁর বলা কথাগুলো এমনভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থাপন করেন যা ধ্বনি মাধুর্য ও শ্রুতিমাধুর্যের অনন্য রূপময়তা দান করে, পাশাপাশি বক্তব্য বিষয়কেও পরিস্ফুটিত করেন ভিন্নরূপে।

৩. দাতব্য চিকিৎসালয় খুলেছি আমরা পেছাপথানায় (ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা - শৈলেশ্বর ঘোষ) -



বাংলা বাক্যের মৌলিক গঠন হল- কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া। কিন্তু এই বাক্যটির গঠনরূপ কর্ম- ক্রিয়া-কর্তা। অর্থাৎ কর্তা কর্ম ক্রিয়া পরস্পরের স্থান পরিবর্তন করার জন্য বিচ্যুতি ঘটেছে। বাংলা বাক্য গঠনের নিয়ম অনুসারে এই বাক্যের গঠন হত -

আমরা দাতব্য চিকিৎসালয় পেছাপথানায় খুলেছি।

কিন্তু কর্তা কর্ম ক্রিয়ার স্থান পরিবর্তনে বিচ্যুতি ঘটান কারণে বাক্যের গঠন রূপ দাঁড়িয়েছে -

‘দাতব্য চিকিৎসালয় খুলেছি আমরা পেছাপথানায়’

এখানে বিচ্যুতি গঠনের মধ্য দিয়ে কবি পাঠকের মনে সজোরে আঘাত করেছেন। প্রথাগত ধারণা, মূল্যবোধ, বিশ্বাসের জায়গাটির ভিত নড়ে যায় কবির এধরনের বাক্য প্রয়োগের কারণে। চিকিৎসালয় একটি সেবা কেন্দ্র, যেখানে মানুষের সেবা করা হয়। সেটি একটি পবিত্র স্থান। অন্যদিকে ‘পেছাপথানা’, যেটি মানুষের শরীরের বর্জিত পদার্থের জন্য নির্মিত। চিকিৎসালয়ের সঙ্গে পেছাপথানার তুলনা করে কবি শৈলেশ্বর ঘোষ প্রথাগত মূল্যবোধের ধারণাকে ধ্বংস করতে চেয়েছেন। যা হাংরি আন্দোলনের একটি অন্যতম উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি।

শৈলীবিচারের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ইমেজ বা চিত্রকল্প নির্মাণ। ইংরেজি ‘ইমেজ’ শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলা ভাষায় কেউ একে বলে থাকেন ‘চিত্রকল্প’ তো কেউ আবার ‘বাক্যপ্রতিমা’ বলে উল্লেখ করেন। তবে বাংলা ভাষায় ইংরেজি ‘ইমেজ’ শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে ‘চিত্রকল্প’ শব্দটি বহুল প্রচলিত। চিত্রকল্প বলতে আমরা মূলত শব্দ দিয়ে গড়ে ওঠা ছবিকে বুঝি। ‘ইমেজ’ বা চিত্রকল্পের সর্বজনবিদিত সংজ্ঞাটি হল - ‘A picture made out of the words’। অর্থাৎ শব্দ দ্বারা নির্মিত ছবি। শব্দের দ্বারা নির্মিত ছবি আমাদের অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। সুতরাং বলা যায় যে, সমস্ত শব্দ দ্বারা গঠিত বাক্যসমূহ আমাদের অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলে এক একটি ছবি বা ইমেজে রূপান্তরিত হয়।

আবার অনেকে মনে করে থাকেন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ানুসারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইমেজ বা চিত্রকল্প নির্মাণ হয়ে থাকে। পাশ্চাত্যে একে সেনসরি ইমেজও বলা হয়ে থাকে। আমরা যখন কোনো বাক্য বা শব্দগুচ্ছ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেই ছবি কল্পনায় দেখছি তাকে দৃষ্টিগ্রাহ্য ইমেজ বলছি। যেমন - ‘একটি ধানের শিষের উপর একটি শিশির বিন্দু’ কিংবা ‘পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়া মসীমাখা/ গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাতবেলায়’। এই বাক্য দুটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা চোখের সামনে দুটি ভিন্ন ছবি ভেসে ওঠে। একটি ছবি হল শিশিরে ভেজা ধানের শিষের অপরটি হল মেঘে ঢাকা ছায়াঘন নিবিড় গ্রামের প্রভাতের দৃশ্য। কল্পচক্ষুর সাহায্যে আমরা যেহেতু এই দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি তাই একে আমরা দৃষ্টিগ্রাহ্য ইমেজ বলছি।

চক্ষু ইন্দ্রিয়ের পর যদি আমরা কর্ণ ইন্দ্রিয়ের কথা বলি তাহলে আমরা শ্রুতিগ্রাহ্য ইমেজ পাব। কোনো কিছু শব্দ শোনার পর কিংবা যে সকল শব্দগুচ্ছের দ্বারা ধ্বনি ঝঙ্কার গঠিত হয় তাকে আমরা শ্রুতিগ্রাহ্য ইমেজ বলে থাকি। যেমন- ‘ঘন ঘন ঝন্ ঝন্ বজর নিপাত,/ শুনইতে শ্রবণে মরমে মরি জাত।/ দশদিশে দামিনী দহই বিথার,/ শুনইতে শ্রবণে মরমে মরি জাত’। এখানে ব্যবহৃত ধ্বনিগুলি মাধ্যমে আমাদের চোখের সম্মুখে যে ছবি বা চিত্রকল্প ফুটে ওঠে তা হল - একটি প্রবল বজ্রপাতমুখর মুহূর্তের। যে বজ্রপাতের আওয়াজ শুনে ভয়ে প্রাণ কেঁদে ওঠে, মরে যেতে ইচ্ছা হয়। এখানে ব্যবহৃত শব্দগুলির দ্বারা ধ্বনিঝঙ্কার ভাবের সৃষ্টি হয়েছে তাই একে আমরা শ্রুতিগ্রাহ্য ইমেজ বলতে পারি।

এরপর আসি স্পর্শেন্দ্রিয় নির্ভর এবং স্বাদেন্দ্রিয় নির্ভর চিত্রকল্প বা ইমেজের প্রসঙ্গে। সুকুমার রায়ের একটি কবিতার লাইন এক্ষেত্রে অত্যন্ত উপযোগী - ‘শুনেছ কি বলে গেল সীতানাথ বন্দোয়া?/ আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ?/ টক টক থাকে নাকো হলে পরে বৃষ্টি-/ তখনও দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি।’ এখানে ব্যবহৃত ‘টক টক’ ও ‘মিষ্টি’ শব্দগুলি স্বাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যদিকে গন্ধ শব্দটি ঘ্রাণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কবি এখানে মিশ্র ইমেজ নির্মাণ করেছেন।

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের কবিরা কবিতায় ইমেজ নির্মাণ নিয়ে ব্যঙ্গ করলেও তাঁদেরই বহু কবিতায় নতুন ধরনের ইমেজ নির্মাণ লক্ষণীয়। হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের কবিদের কবিতার ভাষায় চিত্রকল্পের নানা বৈচিত্র্যতা লক্ষ করা যায়, যা কবিদের শৈলীগত স্বাতন্ত্র্যতা নির্দেশ করে। পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যতীত প্রকৃতি, মানব শরীর, অনুভূতি, স্থান ইত্যাদির

বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁরা অসাধারণ ও ভিন্নধর্মী চিত্রকল্প নির্মাণের দক্ষতা দেখিয়েছেন। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে সেগুলি আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

- ১। ‘ধু ধু রিজ প্রান্তরের দিকে শাবক প্রসব করে রঙিন প্রপাত
চারিদিকে ফলপ্রসূ হয়ে গেছে রাশি রাশি প্রতিহারী ধান
মনে হয় বহুক্ষণ মাঠে মাঠে গড়াগড়ি দিয়ে বিছানায় উঠে আসে নারী
ক্ষুধার্ত শিকড়গুলি ঢেকে যায় নীড় আশ্বাদনে
তখনই উৎপন্ন হওয়ার গন্ধ জাগে, কৃষকের উর্বর শরীরে
প্লুত আবছা আঁধারে তাই বারবার মনে হয় পৃথিবীর সহজ সুদিন...’^{১০}

হাংরি কবিদের কবিতায় ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলির মধ্যে এটি একটি অপূর্ব চিত্রকল্পের নিদর্শন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এটি প্রকৃতি অবলম্বিত চিত্রকল্প। এখানে কবি স্তন্যপায়ী প্রাণীর সন্তান প্রসব করার ক্ষমতার প্যারালাল একটি চিত্রকল্প আঁকেছেন চলমান জলপ্রপাতের উপর। জলপ্রপাতে ধাবমান এক একটি স্রোতকে কবি শাবক প্রসব করার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবি যখন জলপ্রপাতের শাবক প্রসব করার উপমা প্রয়োগ করেন তখন পাঠকের কল্পনায় জলপ্রপাতের দৃশ্য ফুটে ওঠার অবকাশ পায়।

- ২। ‘রেলের মোটা তার বেয়ে উড়ে যাচ্ছে ৭৪ কোটি মাছি।’^{১১}

উদ্ধৃত বাক্যে যে শব্দচিত্রটি দেখা যাচ্ছে সেটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের কল্পনায় রেলের লাইন, রেলের মোটা তার ও সারি সারি লক্ষাধিক মাছির ভ্রমণ যাত্রার ছবি ফুটে ওঠে। পাঠক তার পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর ভর করে মাছির উড়ে বেড়ানোকে ভ্রমণ হিসাবে কল্পনা করে নেন। কিন্তু রেলের মোটা তার বেয়ে একই সঙ্গে ৭৪ কোটি মাছির উড়ে যাওয়ার যে বর্ণনা কবির কল্পনায় ভেসে উঠেছে তা পাঠককে এক মুহূর্তের জন্য অবাক করে দেয়। পাশাপাশি কবির এ ধরনের কল্পনা পাঠকের ভাবনার জগতকে সচল করে তোলে। এখানে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মতনই মাছি যেন একস্থান থেকে অন্যস্থানে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়েছে। রেলের তারে গা বেয়ে উড়ে যাওয়া একদল মাছির চিত্রকল্প ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কবির তুচ্ছ জিনিসের প্রতি আগ্রহ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

- ৩। ‘লাল হলুদ কাঁচের জানলার দিকে তাকিয়ে সেদিন অকস্মাৎ
বিকালের অপরিচ্ছন্ন মুহূর্তে আমি জটিলতাহীন
সূর্যরশ্মির দিকে চোখ মেলে পোপের সাম্রাজ্য আর
তার অসুখের রহস্যময় বীজানুর স্থিতিস্থাপকতা।’^{১২}

উদ্ধৃত পংক্তিগুলির মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে অবলম্বন করে একটি চিত্রকল্প গড়ে উঠেছে। বিকালের রক্তিম আভায় মিলে মিশে একাকার হয়ে যাওয়া কাঁচের জানালাকে যেন লাল হলুদ কাঁচের জানালা মনে হয়েছে কবির। পড়ন্ত বিকালে অস্তগামী সূর্যের লাল হলুদ আভা আকাশ যেন সারা গায়ে মেখে নেয়। সূর্য অস্ত গেলেও কিছুক্ষণের জন্য সে আভা স্থায়ী হলেও দীর্ঘস্থায়ী হয় না, কালের নিয়মে তা মলিন হয়ে যায়। ঠিক সেভাবে পোপসাম্রাজ্য ধ্বংস হলেও বীজাণুর মতো তার স্থিতিস্থাপকতা রয়ে গেছে। বীজাণুর মতো ছোট ছোট সংখ্যাহীন, ধূর্ত কোমল মাতব্বর ইশ্বরের আবির্ভাব হয়েছে। কবি পড়ন্ত বিকালের সূর্যের লাল আভার স্থায়িত্বের সঙ্গে পোপ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের সমান্তরাল একটা ছবি অঙ্কন করেছেন।

- ৪। ‘যোনি কেশরে কাঁচের টুকরোর মতো সুস্থতা’।^{১৩}

বহু প্রাচীনকাল থেকে নারী দেহের রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনায় কবিদের মন নিবিষ্ট থাকে। নারী শরীরের সৌন্দর্য প্রকাশে কবির সহস্র উপমা ব্যবহার করে এসেছেন। যা শৈল্পিক পদ্ধতির অন্তর্গত বলা চলে। এখানে কবি মলয় রায়চৌধুরী নারীর দেহের বিশেষ একটি স্থানের উপমা দিতে গিয়ে চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। কবি এখানে যে উপমা ব্যবহার করেছেন এরূপ উপমা বোধকরি এর পূর্বে আর কোনো কবি ব্যবহার করেননি। প্রথাবহির্ভূত ভিন্নতর কিছু করতে গিয়ে কবি এ ধরনের উপমা ব্যবহার করেছেন বলা যায়। কবি যেন এখানে ‘একটি ধানের শিষের উপর একটি শিশির বিন্দু’র সমান্তরাল একটি চিত্রকল্প আঁকেছেন। সকালে ধানের শিষের উপর পড়ে থাকা শিশিরবিন্দুকে যেমন কাঁচের টুকরোর মতো লাগে, কচু কিংবা পদ্ম

পাতায় জমে থাকা জলবিন্দুকে যেমন কাঁচের টুকরোর মতো দেখতে লাগে তার একটি আলাদা সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। ঠিক তেমনি কবি যেন তাঁর প্রিয়তমা শুভার যোনি কেশরের জমে থাকা ঘর্মের সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য কাঁচের টুকরোর উপমা প্রয়োগ করেছেন। এখানে আমরা ভিন্নধর্মী চিত্রকল্প নির্মাণে কবি দক্ষতার পরিচয় পাই।

Reference:

১. মজুমদার, পরেশচন্দ্র, মজুমদার, অভিজিৎ, বাংলা সাহিত্যপাঠ শৈলীগত অনুধাবন, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৬, শ্রাবণ ১৪২৩ পৃ. ৭
২. <https://hungryderphoto.wordpress.com/category/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%82%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE>
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, বঙ্গীয় শব্দকোষ (১ম খণ্ড), কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি নবম মুদ্রণ ২০১৬, পৃ. ২৪৮
৪. <https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%82%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE>
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, বঙ্গীয় শব্দকোষ (১ম খণ্ড), কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, নবম মুদ্রণ ২০১৬, পৃ. ৩৬২
৬. সেন, সুকুমার (সম্পা.), কবিকঙ্কন মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৭, পৃ. ৮৪
৭. সেন, সব্যসাচী (সম্পা.), হাংরি জেনারেশন রচনা সংগ্রহ, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৩
৮. চক্রবর্তী, উদয়কুমার, চক্রবর্তী, নীলিমা, ভাষাবিজ্ঞান, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৩০৭
৯. সেন, সব্যসাচী (সম্পা.), হাংরি জেনারেশন রচনা সংগ্রহ, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৫৯
১০. তদেব, পৃ. ৬৫
১১. <https://www.poetrystate.com/malay/%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%AE%E0%A6%BE/>
১২. সেন, সব্যসাচী (সম্পা.), হাংরি জেনারেশন রচনা সংগ্রহ, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১১৫
১৩. [https://hungryandolon.blogspot.com/2019/07/blog-post_27.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/TlDPI+\(%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B0%E0%A6%BF+%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%A8+%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9\)&m=1](https://hungryandolon.blogspot.com/2019/07/blog-post_27.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/TlDPI+(%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B0%E0%A6%BF+%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%A8+%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9)&m=1)
১৪. <https://www.poetrystate.com/p/tridib/>

၁၉. <https://www.poetrystate.com/hungry-generation/%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BF/>
၁၉. <https://hungryderphoto.wordpress.com/category/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0/>